KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতা ভবন, 202 রাসবিহারী এভিনিউ
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5·5" x 8·5"
Vol. & Number : 12/2 15/2 15/3 17/2 18/2	Year of Publication : Dec 1946 March 1950 (ফাল্গুন ১৩৫৯) Dec 1952 Feb 1954
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

চৈত্র ১৩৫৬

চীনে কবিতার অনুবাদ ও আলোচনা
বুদ্ধদেব বসু

কবিতা

জীবনানন্দ দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণু দে, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, নরেশ গুহ, মৃণালকান্তি, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র পাল, শঙ্খ ঘোষ, মণীন্দ্র রায়,
NOEL SCOTT

সমালোচনা
বু. ব.

পত্র
নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

বার্ষিক চার টাকা

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু

কবিতা

পুরোনো সংখ্যা

পরিবর্তিত তালিকা

১৩৪৪	পৌষ, চৈত্র
১৩৪৫	আষাঢ়, চৈত্র
১৩৪৬	আশ্বিন
১৩৪৮	আশ্বিন, কার্তিক, চৈত্র
১৩৪৯	আশ্বিন, পৌষ
১৩৫০	আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ
১৩৫১	আশ্বিন, চৈত্র
১৩৫২	আষাঢ়

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
সবগুলি একসঙ্গে ২৫% কম
[মাশুল স্বতন্ত্র]

সম্পূর্ণ সেট

একাদশ বর্ষ	৩৲
দ্বাদশ বর্ষ	৪৲
ত্রয়োদশ বর্ষ	৪৲
চতুর্দশ বর্ষ	৪৲
একাদশ ও দ্বাদশ একসঙ্গে	৫৲
একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ একসঙ্গে	৮৲
চার বছর একসঙ্গে	১০৲

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

সুমিত্রার অপমৃত্যু
৪৲
মনোলীনা
২৷৷০
বিচিত্র হৃদয়
২৲
সেতুবন্ধ
২৷৷০
অপরূপা
৷০

বৈশাখী

কবিতাভবনের বার্ষিকী
গল্প উপন্যাস কবিতা
প্রবন্ধ আলোচনা ছবি
বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক ও শিল্পীদের রচনা

দ্বিতীয় খণ্ড	১৩৫০	২৲
তৃতীয় খণ্ড	১৩৫১	২৲
চতুর্থ খণ্ড	১৩৫২	২৲
পঞ্চম খণ্ড	১৩৫৩	১৷৷০
চার খণ্ড একসঙ্গে		৬৲

কবিতাভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

কবিতা

পঞ্চদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা চৈত্র ১৩৫৬ ক্রমিক সংখ্যা ৬৪

চীনে কবিতা

আমার পিতৃব্য রাজগ্রন্থাগারিক ইউন-এর বিদায়-ভোজে

আহা সেই যৌবনের দিন দিয়েছি ছড়িয়ে উড়িয়ে।
কত হাসি কত গান,
বন্ধুমহলে সুশ্রী মুখের জাঁক। আজ হঠাৎ
ফুরোলো গান বুড়ো হলাম বুঝি না বুঝেও বুঝি না।
তবু ফিরে আসে বসন্ত, দেখে মন ভরে আনন্দে।
এখনই, বন্ধু, যাবে ?
এসো তবে এই একটু সময় হালকা ওড়াই
সুখের হাওয়ায়। বাইরে চলো।

মুকুল ধরেছে প্লামের ডালে, ডাকছে পাখি,
আনো সুরা, আনো গান।
বিকেলের আলো পাহাড়ের পায়ে লুটোয়,
এসো আর-একটু বেড়াই।

একটু পরেই কেউ আর নেই, অন্ধকার। বাঁশের ঝাড়
কী-চুপচাপ।
রাত কত হ'লো, এবার দরজা বন্ধ করো।

লি পো (৭০১—৬২)

পাহাড়ি পথ

সরু পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠলাম,
পাথরে পা কাটলো।
থামলাম না, মন্দিরে চলেছি।
পৌঁছতে দেরি হ'লো।
সন্ধ্যা তখন, অন্ধকারে বাদুড় নড়ছে,
মণ্ডপের ঠাণ্ডায় গা জুড়োলো।
সেখানে ফুল ফুটেছে টগর, মস্ত কলাপাতা হাওয়ায় দুলছে—
আহা, বৃষ্টি-ভেজা।
ভিতরে আঁকা আছেন তথাগত, এসো দেখবে,
ব'লে পুরুৎঠাকুর সঙ্গে চললেন আমার,
আলো এনে তুলে ধরলেন দেয়ালে—
আশ্চর্য ছবি।
মাদুর ঝেড়ে দিলেন নিজের হাতে, আনলেন খাবার,
লাল চালের মোটা ভাত, অড়র ডাল, সদ্ভভ শুন।
খিদে মিটলো।
রাত হ'লো, শুয়ে-শুয়ে একটি পোকার ডাকও আর শুনি না
চাঁদ এলো আমার ঘরে, শান্ত, সুন্দর।···
ভোর হ'তেই বেরিয়ে পড়েছি আবার, ঘুরতে-ঘুরতে
পথের ভুল হ'লো,
এই লুকোই, এই বেরোই, ওঠা-নামার ঘোরপ্যাঁচ
ফুরোয় না।
এদিকে ঘন কুয়াশায়
বেগনি রং ধরলো পাহাড়ে, ছড়িয়ে গেলো সবুজ,
আকাশ থেকে ঝর্নার জলে ঝলমল।
চলেছি পাইনবন পেরিয়ে,

হঠাৎ ওকগাছের ধার ঘেঁষে—প্রকাণ্ড, দশ জোয়ান
বেড় পায় না—
নামছি ঝর্নার খরস্রোতে কাঁকর মাড়িয়ে,
হাওয়ায় গান ওঠে ছলছল···ছলছল।
চলো,
কাপড় ভেজে ভিজুক,
মিলাক আরো দূরে শহর,
প'ড়ে থাক পিছনে আমার আপন দেশ, আমার পুঁথিপত্র,
রাজার কাছে দরবার।
কাজ কিছু শেষ হয়নি, না-ই বা হ'লো,
আমার বাছা-বাছা তুখোড় ছাত্ররা ব'সে থাকবে—
ক-দিন আর থাকবে।
আমি বুড়ো হয়েছি, আমার এখানেই ভালো।

হান ইউ (৭৬৮—৮২৪)

চাঁদের উৎসবে

(সব-ডেপুটি চাং-কে)

মেঘ স'রে গেলো, ছায়াপথ মিলায়,
হাওয়ার ধার ঝেঁটিয়ে নিলো আকাশ, চাঁদের ঢেউ ফুলে
উঠলো,
বালি মসৃণ, জল শান্ত, শব্দ নেই, ছায়া নেই জ্যোছনায়।
এসো বন্ধু, এই নাও সুরা, আজ তোমার গান শুনবো।
তুমি গান ধরলে—কিন্তু কেমন গান? কান্নার মতো,
আমার দু-চোখ ছাপিয়ে গেলো শুনতে-শুনতে।

'তুং-তিং হ্রদ যেখানে আকাশে মেশে
নয়-সংশয় উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়,
যেখানে ড্যাগন, হাঙর উঠছে, ডুবছে,
ডাকছে বানর, কাঁদছে উড়োশেয়াল।
ধুকধুক বুকে আঁকড়ে প্রাণ
চাকরিতে আমি পৌঁছলাম,
সঙ্গহীন, শব্দহীন
লুকিয়ে যেন পালিয়ে আছি।
বিছানা ছেড়ে উঠতে ভয়, সাপের ভয়,
খাবারে মেশা বিষের ভয়,
হ্রদের হাওয়ায় রোগের বীজ,
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ তার।···
কাল শুনলেম জেলাম হাকিম
রটিয়ে দিলেন ঢাক পিটিয়ে
রাজত্বের বদল হ'লো ;
সিংহাসনে নতুন এক
সম্রাটের আমল শুরু।
লম্বা ক্ষমার ইস্তাহার
ছুটছে রোজ চারশো মাইল,
মৃত্যু যাদের দণ্ড, সবাই
মুক্তি পেলো, নির্বাসিত
ফিরলো ঘরে, চুনোপুঁটির
ফিরলো কপাল, বেহুঁশ ঘুষখোরের দল
এক কলমে বাতিল—
সজ্জনের নাম উঠলো দপ্তরে।
আমার নামও পাঠিয়েছিলেন বড়ো হাকিম,

লাটসাহেব কানেও সেটা নিলেন না,
উল্টে আমায় বদলি ক'রে দিলেন এই
জংলি পচা মফস্বলে।
চাকরি আমার একেবারে নিচু ধাপের,
কী বা হবে নাম ক'রে—
কোনদিন না শুনি আমার শাস্তি হ'লো
চৌরাস্তায় পঁচিশ বেত।
আমার সঙ্গে ঘর-তাড়ানো আর যারা
ফিরছে এবার একে-একে,
সে-পথে পা ফেলার আশা
অসম্ভব স্বর্গ আমার,
অসম্ভব, অসম্ভব।'

···দোহাই, গান থামাও, আমার গান শোনো এবার,
অন্য গান, ভিন্ন সুর—আকাশের গান শুনতে পাও না ?

'মাঝে-মাঝে চাঁদ যদিও আসে
এমন চাঁদ কি ফিরবে ?
কে জানে আবার কবে বসন্ত
এই সৈকতে ভিড়বে।
যদি ঠেলে দাও আজকের সুরা
কাল কি ভরবে পেয়ালা,
কাঁদলে কি আর ভাগ্য ভুলবে,
চলবে সে তার খেয়ালে।'

হান ইউ

পাহাড় চড়ার স্বপ্ন

বুক ফুলিয়ে পাহাড়ে চড়ি আমি,
বেরিয়ে পড়ি লম্বা লাঠি হাতে একলা।
হাজার চূড়া, অসংখ্য উপত্যকা,
একটি বাকি থাকলো না, সব ঘুরে-ঘুরে দেখলাম।
ক্লান্তি নেই, জিরোতে হয় না একবার,
জোয়ান পা, নিশ্বাসে যৌবন।
···সব স্বপ্ন, রোজ রাত্রে এই স্বপ্ন দেখি।

কিন্তু কেমন ক'রে?
মন যখন স্মৃতির পথে পিছনে ফেরে
শরীরেও যৌবন আসে আবার?
শরীর কি মনেরই তবে ছায়া?
তাহ'লে কেন শরীর ভেঙে পাত হ'লেও মনের তেজ
ফুরোতে চায় না?

না, দুটোই মায়া।
স্বপ্ন মিথ্যে, বাস্তবও সত্য না।
ছাখো-না দিনে আমার থরথর ক'রে পা কাঁপে,
আবার রাত্রি ভ'রে লাফিয়ে বেড়াই পাহাড়ে।
এদিকে দিন যত, রাত্রিও ততক্ষণ,
তাই দিনে আমার যত লোকশান, রাত্রে ঠিক ততটাই
আমার লাভ।

পো চু-ই (৭৭২—৮৪৬)

গাছ ছাঁটা

ঠিক আমার জানলাটারই সামনে দেখি
গাছের সারি উঁচু হ'লো, পল্লবে পুরন্ত ডাল,
হায় দূরের পাহাড় তাতে আড়াল—
ফাঁকে-ফাঁকে ঝিলিক দিয়েই লুকোয়।
সেদিন আমি কুড়োল নিয়ে বেরোলাম,
এক-এক কোপে এক-এক ঝোপ সাবাড়।
কত হাজার পাতা ঝরলো গায়ে মাথায়,
হাজার চূড়া হঠাৎ কাছে এলো।
মনে হ'লো মেঘের ঘোর আব্রু ছিঁড়ে
নিঃশঙ্কে মুখ দেখালো নীল,
মনে হ'লো কত যুগের পরে, বন্ধু,
আবার তোমার দেখা পেলাম।
প্রথমে মৃদু হাওয়ার ঢেউ ব'য়ে গেলো,
একে-একে পাখি ফিরলো ডালে।
মনের ভার নামাতে চাই অবাধ নৈঋতে,
চোখের তাক পাহাড়ে, মন—কোথায়।
সত্যি কথা, পক্ষপাত আছেই আছে,
বলো তো কোন ভালোয় কিছু মিশোল নেই।
কচিপাতার সবুজও ভালোবেসেছিলাম,
আরো ভালোবাসি পাহাড়, এইটুকুই দোষ।

পো চু-ই

মৃতা পত্নীকে

বাপের ছোটো মেয়ে, আদরিণী তুমি,
অদৃষ্টের দোষে এই গরিব পণ্ডিতের হাতে পড়লে
আমার ছেঁড়া জামায় চোখ নামিয়ে যখন রিপু করতে,
আমি তোমার মন ভিজিয়ে, আস্তে
দু-একটা সোনার কাঁটা খুলে নিতাম খোঁপার—
মদ কেনা চাই তো।
বুনো আনাজ রাঁধতে
পাতা পুড়িয়ে উনুন জ্বেলে।
···আজ শুনছি ওরা সভা ডাকছে, আমার লাখ টাকার ডালি
নাকি তৈরি—
আজ তোমায় কী দেবো তা-ই ভাবি।
তোমার নামে মন্দিরে পুজো? এই?

২

কে আগে মরবে বলো তো? আমি! না, আমি!
কত ঠাট্টা দু-জনে ব'সে করেছি।
একদিন হঠাৎ তুমি চ'লে গেলে
আমার চোখের উপর দিয়ে, তুমি।
তোমার জামাকাপড় সবই প্রায় বিলিয়ে দিলাম,
তোমার শেলাইয়ের বাক্স কখনো খুলি না, সাহস নেই।···
ঝি-চাকর সকলের দিকে তোমার হাত ছিলো দরাজ,
আমিও সেটা রেখেছি, কিন্তু তোমার মতো হয় না।
···বুদ্ধের কথা সত্য, বেঁচে থাকলে প্রিয়বিয়োগ হবেই,
কেউ নিস্তার পায় না;

তবু বলি, একসঙ্গে আধপেটা খেয়ে দিনের পর দিন যাদের
কেটেছে,
এ-দুঃখ তাদের মতো কি আর কারো।

৩

দুঃখ শুধু তোমার জন্য?
না, নিজের কথাও ভাবি।
সত্তর হ'তে কত আর দেরি আমার?
আমি তো ভালো-মন্দয় সাধারণ—
দেখেছি মহৎ মানুষ, কে জানে কার শাপে নিঃসন্তান।
আমি তো চলনসই পদ্য লিখি,
শুনেছি মহাকবির কথা, তাঁর ডাকেও ওপার থেকে
সাড়া দেয়নি ঘরনী।
মৃত্যুর পরে মিলন?
বিশ্বাস করি না, তুমিও কোনোদিন করোনি।
সেই অন্ধকারেই শেষ, আর আশা নেই, জানি।
তবু
রাত্রি ভ'রে চোখ মেলে তাকিয়ে
আমি দেখতে পাই
তোমার মেঘলা কপালে
তোমার সমস্ত জীবনের সংসার চালাবার
দুশ্চিন্তা।

য়ুআন চন (৭৭৯—৮৩৯)

অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু

মন্তব্য

জাপানি বাদ দিলে, প্রাচ্য পাশ্চাত্য অন্য কোনো কবিতার সঙ্গে চীনে কবিতার কিছুই মেলে না। আমরা যাকে বলি বড়ো ভাব, বড়ো বিষয়, চীনে কবিতায় তা নেই, আমরা যাকে বলি গভীরতা তাও না। আবেগ, সংরাগ, আকৃতি, ভক্তি, কামুকতা, এর প্রত্যেকটি বর্জন ক'রে এই কবিতা তার স্বকীয়তায় আশ্চর্য ফুটে আছে। গতানুগতিও দুই ক্ষেত্রে বিভিন্ন। বিশ্ব-কবিতার একটি বিরাট অপাঠ্য এবং একটি উৎকৃষ্ট বড়ো অংশের যে-দুটি বিষয় অবলম্বন, সেই প্রেম আর কাম, কিংবা ঐশ্বরিক আর যৌন প্রেম, এখানে অনন্য-রূপে বিরল। এ-দুয়ের সাক্ষাৎ পাই চীনে কবিতার আদিপর্বে, কিংবা দূরতর লোকগাথায়। খৃঃ পূঃ ৫০০ সালেরও আগেকার নাম-না-জানা গেঁয়ো কবির একটি গীতিকা তুলে দিচ্ছি :

হাটের পথে চলতে গিয়ে
যদি তোমার আঁচল ছুঁই,
রাগ কোরো না :
সে-সব কথা কেমন ক'রে ভুলি।

হাটের পথে চলতে গিয়ে
যদি তোমার হাতেই হাত রাখি,
রাগ করবে—?
সে-সব দিন ভুলতে পারি না তো।

জন্মমৃত্যুর রহস্য বা স্রষ্টার মহিমা নিয়ে দু-একজন আদিকবি যাঁরা ভেবেছেন, তাঁদের মধ্যে চাং হং (খৃঃ পূঃ ১৩৯-৭৮) সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে গণিতে জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো, কিন্তু তাঁর নামে প্রচলিত কবিতা অন্য কারো লেখা। তা রচনা যাঁরই হোক, 'চুয়াং জু-র অস্থি' কবিতার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

আমি এখন ইন আর ইয়াং-এ ভাসছি
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে, প্রকৃতিই আমার স্বভাব,
স্রষ্টা নিজে এখন আমার বাবা, আমার মা,
আকাশ আমার বিছানা, মাটি আমার বালিশ,
বজ্র আর বিদ্যুৎ আমার ডঙ্কা আর পাখা,
সূর্য চন্দ্র আমার প্রদীপ, আমার বাতি,

আমার পাহাড়ি ঝরনা হচ্ছে মেঘ আর আকাশগঙ্গা,
আকাশের তারা আমার মণিমুক্তা।
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছি আমি।
বাসনা নেই, লিপ্সা নেই,
ধুয়ে আমাকে সাফ করতে পারবে না,
নোংরা ক'রে ময়লা করতে পারবে না আমাকে,
আমি কোথাও যাই না তবু ঠিক পৌঁছই,
ব্যস্ত নই, তবু দ্রুত।

(অনুবাদ—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কবিতা', পৌষ ১৩৫২)

অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন এই কবির সঙ্গে তুলনীয় চাং হং-এরই সম-সাময়িক ওয়াং ইয়েন-শু (আনুমানিক ৬৩০ খৃঃ)। এঁর 'বাঁদর' কবিতার আরম্ভ :

আশ্চর্য মহান তিনি, অসম্ভব তাঁর উদ্‌ভাবন,
যিনি এই আকাশের বিস্ময় বানালেন, পৃথিবীর ইন্দ্রজাল।
অলোক সেই শক্তি, যিনি কত ক্ষুদ্রকে
কত গোপন সুন্দর ক'রে গড়লেন, সকলের মধ্যে সঞ্চরমান।
ছাখো এই বাঁদরটাকে, ধূর্ত, ছোট্ট এইটুকু,
কদাকার; মুখটা কুঁকড়োনো যেন বয়োবৃদ্ধ,
এদিকে শরীর যেন বাচ্চা খোকার।...

এ-সব কবিতায় যে-প্রবলতা পাই, বিখ্যাত পরবর্তীদের সুপক্ক কারুকর্মে তা লুপ্তপ্রায়। এর কুললক্ষণ পৃথিবীর অন্যান্য কবিতারই অনুরূপ; এখানে চীনে কবিতাকে মনে হয় সংস্কৃত বা লাটিন বা ইংরেজি বা বাংলা কাব্যেরই সধর্মী। কিন্তু চীন-সভ্যতার বিকাশকালে কবিতার আকাশ-যাত্রা বন্ধ হ'লো, এই উদার উচ্চারণও টিঁকলো না। এর কারণ অনেকে বলেন এপিক কাব্যের অভাব। চীনেদের রামায়ণ মহাভারত বা ইলিয়াড ওডেসি নেই, নাটকও দেখা দিয়েছিলো মাত্র তেরো শতকে। ইওরোপে বা ভারতে, যেখানে এপিক থেকে নাটকের এবং নাটক থেকে গীতিকার জন্ম, সেখানে গীতিকাব্য আবেগে আন্দোলিত, অলংকারে সমৃদ্ধ, নাটকীয় কথনভঙ্গিতে শতবিচিত্র। চীনে কবিতায় ও-সব গুণ কিছুই বর্তালো না, তার পরিণতি হ'লো একেবারে অন্য পথে। আট-নয় শতকে

বহুবিশ্রুত তা'ং বংশের রাজত্বকালে তার পূর্ণপ্রস্ফুটিত স্বরূপ দেখতে পাই। দুটো লক্ষণ প্রথমেই চোখে পড়ে: বিষয়বস্তু সংকীর্ণ, অলংকার—আমাদের অভ্যস্ত অলংকার—অতিবিরল। বিষয়ের মধ্যে বন্ধুতা, বন্ধুবিচ্ছেদ, অন্যতম। বন্ধু মানে বঁধু নয়, পুরুষের পুরুষ বন্ধু। মনোবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এর যা ব্যাখ্যা হবে তা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু কবিতার পক্ষে তা অবান্তর। তাছাড়া কবিতামাত্রেই কিছু-না-কিছু মামুলি, প্রচলিত সমাজ-বিধানে বাঁধা; পারসিক সাকিও নবকিশোর—যদিও ওমর খৈয়মের বাংলা সংস্করণে তার মেনকামূর্তির ছড়াছড়ি—শেক্সপীয়রের সনেটও অধিকাংশ এক রূপবান যুবার স্তুতিবাদ। এখানে কথাটা এই যে উপলক্ষ্য যা-ই হোক, কবিতাটা খাঁটি কিনা। পিতৃব্যবিরহে কাতর হ'য়ে কোনো বাঙালি কবির সাত পুরুষে কেউ কবিতা লেখেনি, কিন্তু লি পোর কবিতাটিতে আমরা উপলক্ষ্য ভুলে যাই, তাঁর দরজা বন্ধ করার শেষ দীর্ঘশ্বাসটি আমরাও ফেলি—এখানেই কবি জিতে গেলেন। চীনের উজ্জয়িনী-যুগের এই রীতি, বন্ধু বিনে গীত নেই, দুঃখ মানে বন্ধুর বিদায়, বন্ধুর মুখদর্শন সুখের উদাহরণ। ব্যতিক্রমস্বরূপ এজরা পাউণ্ড রিহাকু-র (৮ শতক) দু-একটি রত্ন উদ্ধার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের প্রসাদে ষোড়শী সওদাগর-বৌয়ের বিস্ময়কর বিরহলিপি আজ অনেক বাংলা পাঠকও পড়েছেন। মৃতা পত্নীর স্মরণে য়ুআন চন-এর খেদোক্তিও এমনি আর-একটি প্রথাচ্যুত বিস্ময়।

দ্বিতীয় বড়ো বিষয় চাকুরিজীবীর আক্ষেপ, বদলির বিড়ম্বনা, নির্বাসনের দুর্ভোগ। পুরোনো চীন কবিরা প্রায় সকলেই ছিলেন 'ডেপুটিজাতীয় জীব'; শুধু তা-ই নয়, সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে পদ্যরচনা তখন আবশ্যিক ছিলো। এতে যেমন মামুলি পদ্যে দেশ ছেয়েছিলো, তেমনি সুবিধেও ছিলো এইটুকু যে সৎ কবিকে সমাজে একঘরে হ'তে হয়নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনকরাও অনেকে ডেপুটি, তাছাড়া বর্তমান ফ্রান্সের দু-জন মুখ্য কবি, ক্লোদেল আর সাঁ-জন পের্স, রাজদূতের কর্ম করেন, কিন্তু কর্মজীবন আর কবিজীবন উভয়তই একান্ত বিচ্ছিন্ন। চীন সভ্যতার চারিত্রলক্ষণ রাজকর্মে আর কবিকর্মে পরস্পর-সম্বদ্ধ, যার ফলে চাকরিটাসুদ্ধ—ব্যঙ্গকবিতার না, হার্দ্য কবিতার বিষয়ীভূত।

আপাতবিরোধী ও-দুয়ের মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দ সহযোগ অন্য কোথাও ঘটেনি; আজ পর্যন্ত চৈনিক রাজপুরুষ সাধারণত কাব্যরসিক, এমনকি কাব্যকার—স্বয়ং মাও ৎসে তুং কবিতা লেখেন।

কিন্তু বিষয় বলতে প্রকৃতিই সর্বস্ব, তাকে বাদ দিয়ে কোনো কথাই বলা যায় না। 'মৃতা পত্নীকে' কবিতায় আকাশ, গাছ কি পাহাড়ের কথা একবারও নেই দেখে অবাক লাগে কেমন ক'রে চীনে কবির হাত দিয়ে বেরিয়েছিলো। যেমন চিত্রকলায়, তেমনি কাব্যে, প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সহবাসের চেতনা বিশিষ্ট চৈনিক ধর্ম। এর কোনো জুড়ি নেই। দেশে কালে বিচ্ছিন্ন বিসদৃশ অন্য যত কবির কথাই মনে করি, সকলের কাছেই প্রকৃতি হয় মানবজীবনের পটভূমি, নয়তো উপায়, পথ, কিংবা কোনো বৃহত্তর সত্তার বা বিশ্বসত্তার প্রতিভূ; প্রকৃতির পিঠে চ'ড়ে অনেকেই 'অন্য কোনখানে' পৌঁছন। কিন্তু লি পো, হান ইউ বা পো চ্যু-ইর প্রকৃতিপ্রেম রাসায়নিক অর্থে বিশুদ্ধ, তাতে অন্য আকাঙ্ক্ষার মিশোল নেই। ফুল, মেঘ, হাওয়া, এমনকি জড় পাথরেও তাদের প্রণয়ের কারণ এ নয় যে তারা অমৃতের প্রতীক বা ইঙ্গিত—তারা আছে, এবং তাদের নিয়ে আমিও আছি, এই চেতনাতেই তাঁরা আত্মহারা। যদিও প্রাচ্য, এঁরা হিন্দু বা পারসিক ভক্ত-ভাবের নামগন্ধবর্জিত, পরমাত্মায় নিঃস্পৃহ, এঁদের কথা হাফিজের বা বৈষ্ণবের বা গীতাঞ্জলির নয়। হান ইউর পর্বতপ্রেমে কোনো অমর্ত্য ঈপ্সা নেই, তাকে আমাদের খুবচেনা বৈরাগ্য ভাবলেও ভুল হবে। ধর্মভাবের তুলনায় সৌন্দর্য-বোধ এখানে প্রধান, 'তাঁকে' পাবো কি পাবো না তার চাইতে সৎজীবন বড়ো কথা। তাও দর্শনের প্রভাবে শিক্ষিত সমাজের তখন এই আদর্শ; জ্ঞানী গুণী রাজপুরুষ সকলেই চেয়েছেন মুখর সংসার ছেড়ে দূরে, বনে, পাহাড়ে, সৈকতে, শান্ত নির্মল ভাবুকতায় দিন কাটাতে। ভাবুকতা মানে ধ্যান? না, সুরা চাই, বন্ধু চাই, বীণা চাই। এ-ইচ্ছা শুধু ছবিতে কবিতায় নিবেদন ক'রে তাঁরা ক্ষান্ত হননি, বাস্তবেও প্রয়োগ করেছেন। কবিরা রাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে (কিংবা চাকরি খুইয়ে) কতবার যে বনে গেছেন, আবার ফিরেছেন, আমাদের কাছে সে-কাহিনী কৌতুকাবহ।

আধুনিক পরিভাষায় একে বলে এস্কেপিস্ট। ওটা একটা গাল দেবার

বুলি, তাই অর্থহীন। যদি বলা যায় যে কেবলই বনে যেতে চাইলে কবিতায় বাস্তববোধ ক্ষীণ হবে, আশ্চর্য এই যে এখানে ঠিক উল্টোটারই প্রমাণ পাই। চীনেরাই বিশেষভাবে বাস্তবের কবি, এমনকি সাংসারিকতার; প্রতিদিনের ঘরকন্নার এমন খুঁটিনাটি পৃথিবীর আর-কোনো গীতিকাব্যে মিলবে না। চীনে কবি নির্বস্তুকের বিরোধী, তাঁর আরাধ্য মূর্ত—যাকে বলে কংক্রীট—সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিমাপূজায় তিনি প্রতিশ্রুত। তাই তাঁর প্রকৃতিবর্ণনা একেবারেই যথার্থ, হুবহু চোখে দেখে লেখা, ঠিক যেটুকু দেখা সেটুকুই লেখা। একই কারণে উপমায় তাঁর বিরাগ, উক্তিতেও অনাস্থা। কাব্যের প্রধান উপায় ইঙ্গিত, ইঙ্গিতের উপায় ছবি। চৈনিক চোখে ছবি আর কবিতা একাত্ম; তারা ছবি লেখে, কবিতা আঁকে; তাদের বর্ণমালার অক্ষরও এক-একটি ছবি, ভাবচ্ছবি। যেমন ল্যাণ্ডস্কেপে তাদের পাতার পর পাতা কবিতার মতো প্রবাহ, কবিতায় তেমনি দৃশ্যছবির রূপায়ণ। কখনো দেখা যায় দু-চার লাইনে ছবি এঁকেই কবির তৃপ্তি, ছবির পরে কথা নেই, ছবিটাই কথা।

ভিক্টরীয় উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হ'য়ে আধুনিক পশ্চিমী মন চৈনিক চিত্রলতায় মুগ্ধ হ'লো। অপূর্ব লাগলো এই কম-ক'রে-বলা কবিতা, গলা চড়ে না, ঘোষণা নেই, কোনো কথায় জোর দেয় না, সব কথা খুলেও বলে না। মৃদু, নিস্তাপ, বিষণ্ণ, এর শক্তি সূক্ষ্মতায়, যাথার্থ্যে, অবিচল পার্থিবপ্রণয়ে। উপমার বদলে বস্তুটারই ব্যবহার, বিবৃতির বদলে চিত্রকল্পের প্রয়োগ, চীনেদের কাছে এই দুই সূত্র শিখে নিয়ে এজরা পাউণ্ড তাঁর ইমেজিস্ট আন্দোলনে কেমন কাজে লাগিয়েছিলেন সে-খবর আজ সকলেই জানেন। শুধু ছবির ইঙ্গিতে কবিতা বলার একটি চরম নমুনা পাউণ্ড পেশ করেছেন তাঁর প্রিয় কবি রিহাকুর আর-একটি স্ত্রীপুরুষঘটিত রচনায়:

প্রবালসিঁড়ির বিলাপ

প্রবালসিঁড়ি শিশির প'ড়ে-প'ড়ে শাদা,
কত রাত? আমার মসলিনের মোজা শিশিরে ভিজলো,
স্ফটিকের পরদা টেনে দিয়ে
আমি ব'সে-ব'সে দেখি স্বচ্ছ শরৎ, শরতের চাঁদ।

'প্রবালসিঁড়ি, অতএব প্রাসাদ। বিলাপ, মানে নালিশ কিছু আছে।

মসলিনের মোজা, মানে নায়িকা কোনো পুরসুন্দরী, দাসীদের কেউ না। স্বচ্ছ শরৎ, তাই নালিশের কারণ শীতগ্রীষ্ম নয়। নায়িকা অনেকক্ষণ অপেক্ষমানা, কেননা শিশিরে শুধু সিঁড়িই শাদা হয়নি, মোজাও ভিজে গেছে।' এই ব্যাখ্যা দেবার পরে পাউণ্ড বলছেন, 'স্পষ্ট কোনো অভিযোগ নেই ব'লেই কবিতাটি মহামূল্য।'

অনুবাদে ঠিক বোঝা যাবে না ব'লে পাউণ্ডকে টীকা জুড়তে হয়েছে, কিন্তু মূলত যদি এত অল্পেই এতটা বলা হ'য়ে থাকে তাহ'লে আশ্চর্য বইকি। (জাপানি তানকা ঠিক এই জাতের না—সেখানে কথাটাও ক্ষীণ।) অবশ্য কাব্যের তির্যকরীতি সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে; সংস্কৃতে একে বলতো 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ধ্বনি', কিন্তু 'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী' এর তুলনায় বড্ড বেশি ব'লে ফেললো। আড়িতে বলতে চীনে কবির মতো নিপুণ কেউ না; বস্তুত, অন্য কোনো ভাবে বলতেই তিনি অনভ্যস্ত। ফলত, চীনে কবিতায় বৈচিত্র্য কম, এবং কোনো-কোনো মহৎ কাব্যরূপের সম্ভাবনাই নেই; র‍্যাঁবো-র 'মাতাল তরণী', কি 'বলাকা', কি 'ফোর কোয়ার্টেটস' সেখানে অচিন্ত্য। কিন্তু সেখানে যা আছে তাও অন্য কোথাও নেই ব'লে বিশ্বসভায় তার এত সম্মান, তাছাড়া এখনকার তরুণ বাঙালি কবিরা, যাঁরা নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, চীন সংসর্গে তাঁরা হয়তো সৎপরামর্শ পাবেন।

অন্ধকার

জীবনানন্দ দাশ

('অন্ধকার' কবিতাটি প্রায় সতেরো বছর আগে (১৩৩৯-৪০এ) লেখা হয়েছিল। খুব সম্ভব ১৩৪২ বা ৪৩ এ 'কবিতা'য় দিয়েছিলাম। তখন ছাপানো হয় নি, পরে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছেও কোনো কপি নেই ভেবেছিলাম। পুরোনো খাতা খুঁজতে-খুঁজতে সেদিন বেরিয়ে পড়ল। সতেরো বছর আগের ঠিক সেই মনোস্বভাব এখন নেই আর আমার; এ রকম কবিতা আজ আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।)

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম
আবার;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্দ্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগব না জেনে
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন জাগব না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উষ্ণম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
সে আস্বাদ নষ্ট করবার মত শৈলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমাণ যন্ত্রণা নও—

জান না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জান না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন—
অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব
ব'লে বুঝতে পেরেছি আবার;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের
আর্তনাদে উৎসব সুরু করেছে।
হায়, উৎসব!
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে
থাকতে চেয়েছি।

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনি নি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।

যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর,
এই সব ভয়াবহ আরতি !

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠব
না আর ;
তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে অর্দ্ধেক
ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পউষের
রাতে—কোনোদিন জাগব না জেনে—
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর।

বিভাবরী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত এতো গভীর
এতো বিভোর ?
নেই যে আর ভোর-দুপুর নেই বিকেল—
তোমার রাত দু'ফোঁটা রাত নিরুদ্বেল—
এমন স্থির !

দু'চোখ-ভরা দু'ফোঁটা রাত এমনও হয় !
কী অদ্ভুত !
দু'জনই যেন দু'ফোঁটা রাত—রাতের কেউ
দু'জনই যেন অন্ধকার—রাতের ঢেউ
আকাশময়।

তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত ক্ষণিক রাত—
অনেক রাত
অতীত আর ভবিষ্যৎ উধাও তার,
মায়ের মতো তারার রাতে আকাশ-পার
বাড়ায় হাত !

তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত রাতের ঝড়
কালান্তিক !
দু'জন যেন যোজন-ভরা ঝড়ের মন,
দু'জন যেন করেছি কবে মৃত্যুপণ
পরস্পর ॥

পঞ্চবটী

বিষ্ণু দে

'যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা—' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তুমিই মালিনী, তুমিই তো ফুল জানি।
ফুল দিয়ে যাও হৃদয়ের দ্বারে, মালিনী,
বাতাসে গন্ধ, উৎস কি ফুলদানি,
নাকি সে তোমার হৃদয়সুরভি হাওয়া?

দেহের অতীতে স্মৃতির ধূপ তো জ্বালিনি।
কালের বাগানে থামে নিকো আসাযাওয়া,
ত্রিকাল বেঁধেছ গুচ্ছে তোমার চুলে,
একটি প্রহর ফুলহার দাও খুলে,

কালের মালিনী! তোমাকেই ফুল জানি,
তোমারই শরীরে কালোত্তীর্ণ বাণী,
তোমাকেই রাখী বেঁধে দিই করমূলে,
অতীত থাকুক্ আগামীর সন্ধানী—
তাই দেখে ঐ কাল হাসে দুলে' দুলে'

এখানে ঢেকো না সূর্য, এখানে যে একটি হৃদয়
দুহাতে শীতের রৌদ্র ছড়িয়েছে অনেক—আমারও
জীবনের মাঠে-বাটে নদীপথে পাথরে বাগানে
প্রাণের আরাম আলো ছড়িয়েছে, সে প্রসাদ কারো
আকাশে আনেনি ছায়া, নির্বিশেষ সে হৃদয়দানে
তুলাদণ্ডে রাখেনি সে দাবীদাওয়া ভীরু বিনিময়—

যদিই বা রেখে থাকে, তবু তার হৃদয়ের আলো
ফুলে ফুলে প্রজাপতি, কিম্বা বুঝি ফুলেরই প্রতিমা,
সূর্যঘট ছেয়ে তার বর্ণচ্ছটা যেন ইন্দ্রধনু,
হরধনুর্ভঙ্গে নয়, বরদা সে, ঐশ্বর্য বিলাল
হাসিতে ভঙ্গীতে মিত্রাক্ষরে তার, তার স্বচ্ছ তনু,
বিরহে যা রৌদ্র নয়, মানি, কিন্তু ঝুলনপূর্ণিমা।

কি জানি তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি,
তবু প্রকৃতিতে রূপায়িত মনপ্রাণ।
সে ছবিতে এক হয়ে গেলে তুমি, রূপকে,
হৃদয় সংবেদনে ভরে' দিলে গান।

হয়তো বা ভুল, বৃদ্ধে কিম্বা যুবকে
তোমার কোমল হাতের সঠিক বাণী
বুঝবে, আমি কি শুনেছি নিজেরই ভাষা?
আকাশে মাটিতে জীবনে যে কানাকানি
মনে মনে শুনি সে কি শুধু অনুমান?

জানি না, তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি।
তোমার জীবনে দিগন্ত পটভূমি
শুক্লপক্ষ কতোদিন দেবে তুমি
সে জানো তুমিই, আমার রাতের আয়ু
নাক্ষত্রিক, নিত্য সেখানে বায়
আলো উত্তাপ—আর অতন্দ্র প্রাণ।

এখানে নতুন পাতা, সাইরেনে সাইরেনে
আর এক বছর এল রাত্রি ভেঙে বারোটায়।

কে জানে স্থবির সময়ের দুরন্ত ছোটায়
পরাগ ওড়ায় কে ও! কিইবা হবে তা জেনে?
উদ্বৃত্ত কুড়াই, কালের ফুলের বাগানের
মালিক বা মালীর দাক্ষিণ্যে, মালিনী খেয়ালে
যা দেয় দুহাতে নিই, বাঁধি গতির দেয়ালে।
দান যদি ঝরে, থাকে রেশ কালের গানের,
ছবি থাকে।

হে কাল হে মহাকাল। তাই চাই
আনন্দে মর্মরে সাধারণ্যে দুঃখী সুখী দিনে
দৈনন্দিন তোমাকেই। ভবিষ্যের উৎস স্থির,
অতীত তো বনভূমি, পূর্বাপরে জীবনের তৃণে
চাই না খোদাই ঝর্না সুরসুন্দরীর নৃত্যে।
কিম্বা চাই, মূর্ত ইতিহাসে ত্রিকালেশ্বরীর
গতির ত্রিভঙ্গ তীব্র পঞ্চবটী এই চিত্তে।

পঞ্চবটী ডাকে আজ পান্থজনে, উদ্দাম উধাও
কালের যাত্রার ধ্বনি শোনা যায়, হাওয়ার মর্মরে
শৈশবের হাসি ছোটাছুটি কলরব আজ পাও
শুনতে কি পাও কিছু কালের পাথরে

নতুন ব্যঞ্জনা? আজ প্রতীক কি প্রত্যক্ষ নির্ঝরে?
হেমন্তের দোলা পেল নিদাঘের স্তম্ভিত সন্তাপ?
দম্পতি—চাল্‌শে আর বাইশেও প্রেমের প্রতাপ
মেনে আসে পদচারে অসঙ্কোচ ইতস্তত সবুজবাসরে,

সাইরেনের পরে স্নাত শ্রমিকেরা শুভ্র অবসরে,
নানারঙা ভিড়ে আসে সুরসুন্দরীর পাশে নানান্ বিন্যাসে।

গুন্তিত বৃদ্ধের মতো, যারা আসে রৌদ্রের প্রত্যাশে
মাথায় জড়ানো গল্প সেকালের দূর অভিশাপ

দিনে দিনে সন্ধ্যায় সকালে বৎসরে বৎসরে
কালের প্রাচীন মূর্তি হাসে তারা সাবেক অভ্যাসে?
মালিনী! দেখেছ ঐ খেলার মেলায় কাল সম্পূর্ণ সন্ন্যাসে
আকণ্ঠ তৃপ্তিতে হাসে, খেলেনা ও সাপ!

তোমার মালাটি আজ নিয়ে যাব আমাদের ঘরে।

১৩০০ সালের নায়কের বিলাপ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

দেয়ালে বসুধারার আঁক...দুপুরে দোলে মন—
প্রহর আজ প্রহার কী যে করেছে সারা খন।
তোমাকে মনে পরেছে মনোরমা—
অনেক দূরে যেখানে চোখ—আকাশ ছিলো নীল,
সেখানে মিছে আজকে খুঁজি তোমারি কোনো মিল—
হারানো সেই তনুর তাপ স্বপ্ন সুধু নিয়ে
দড়িতে ঝোলে তোমার পরা জামা
দুপুর ধ'রে তাই তো ধরি তোমাকে মনোরমা
দেয়ালে বসুধারার আঁক...দুপুরে দোলে মন—
প্রহর আজ প্রহার কী যে করেছে সারাখন
দেয়ালে বসুধারার আঁক করে না আজ ক্ষমা—

অনেক কথা অনেক দিন ফিরিয়ে আনে প্রাণে
থেমেছে সুর বহুদিনের গানে
আজকে সারা দুপুর ভ'রে কোথাও গতি নেই
পাথর যেন কোথাও প্রাণ নেই
স্তব্ধ সব, গাছের পাতা মাটিতে হ'লো জমা—

ধূসর তাকে যেখানে থাকে একটি ঘষা ঝামা
গন্ধ তেল, আলতা-নুটি চিরুনিখানি ভাঙা
স্মরণে রোদ রঙিন হ'লো কিসের ক্ষীণ স্বর—
হঠাৎ যেন চকিত হ'লো ঘর!
কয়টি কাঁটা চুলের ফিতে কুঙ্কুমের শিশি
বাড়িতে করা গরিবিয়ানা সাবান তেল দিশি

রয়েছে প'ড়ে সেখানে আজ ধুলোর পুরু সর,
দুপুর কাঁপে আবেগে থরোথর!
এ নয় মিছে মনন আজগুবি
তোমাকে ভেবে দুপুর হ'লো বড্ড বেশি ছবি,
আবেগ আজ মানে না তাই কোলন আর কমা—
চোখের জলে যে-তর্পণ তাতে কি করা চলে
জীবনটাকে যে-ক্ষতি দিয়ে ভরেছো মনোরমা?

Ozymanadias-এর নব পর্যায়

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

শুষনি নদীর বাঁক শুনেছি প্রবাদ
দুপুরে পথিক পেলে রক্ত শুষে খায়
তপ্ত মরু, ধু ধু বালি, মাঠ, ধূলিমুঠি
ধ'রে খালি দুপুর ওড়ায়।
কোথাও বসতি নেই—সবুজের লেশ
শুষনির বাঁক সব চুষে চুষে করেছে নিঃশেষ।
কিছুদূরে বাড়ি ছিলো আজো তার থামেরা দাঁড়ায়—
শতাব্দীর জরা নিয়ে রুগ্ন ছায়া সিকতায় ফেলে
মুমূর্ষুর মতো হাঁকে —এ-পথে কে যায়?

এ-ছায়া শ্যামল ছিলো একদিন পাতার সবুজে।
সে-সবুজ পালিয়েছে বহুদিন দূর কোনো মাঠে,
সরস মাটির কোলে হয়তো বা পেয়েছে আশ্রয়।
কয়টি থামের আড়ে ফেলে গেছে ক'টি ছায়া—করুণ ছলনা।
যারা আজো ঊর্ধ্বমুখী জিভ মেলে মেঘতৃষ্ণায়

আবছায়া সবুজের এক ফোঁটা আস্বাদ তবুও কি
তবু কি পেলো না ?
মেঘছায়া মিছে খুঁজে আকাশের বুকে পেতে চায়—
সে-সবুজ নেই বটে তবু সেই সবুজের স্মৃতি
প্রেত হ'য়ে আজো ঘোরে এ-দগ্ধ চড়ায়।
সিমুমের ফুৎকারে ধূলিমুঠি দুপুর ওড়ায়
শতাব্দীর জরা নিয়ে বালুডাঙা এই মরুমাঠে
বাড়ি নয়, ভগ্নজানু থামেরা দাঁড়ায় !

জীবনের যে-রহস্য সময়ের গূঢ় পরিণাম,
এই সব জরাজীর্ণ থাম—মনে হ'লো এরা সব জানে
পাদপীঠে উৎকীর্ণ কয়ছত্র রয়েছে সেখানে :

গাত্রলিপি

শুন পান্থ এই হর্ম্ম্য উৎপত্তি কথন
ঊষর প্রান্তর হেথা আছিল যখন
শোষণা রাক্ষসী ছিল নদী হৈল হেথা
স্বয়ং বরুণ দেব পাইয়া বারতা
কাকচক্ষু দিঘি এক সাগরের প্রায়
করিতে আদেশ দিলা দাশরথি রায়ে
দাশরথি রায় রাজা প্রবল প্রতাপ
ইন্দ্রতুল্য বৈভব কেবা করে মাপ
স্থাপিলা বিলাস ধাম নন্দন-কানন
উদ্যান মধ্যে তেঁই করিলা খনন
কাকচক্ষু সরোবর পরম শোভন
বরুণে দিলেন ভার করিতে রক্ষণ
আয়তনে হৈল দিঘি সাগরের প্রায়
প্রবল প্রতাপ রাজা দাশরথি রায়

বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী দিলা করিতে পত্তন
পঞ্চশত বিঘা তেঁই হৈলা ভদ্রাসন।
ইতি। শুভ বঙ্গাব্দ—১১০০শো সন।

প'ড়েই চমকে উঠি
পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে কেউ ছুটে যায়—
আচমকা দু'চোখ ফেরাই
ভয়ে ভেঙে যায় স্বর তবুও চ্যাঁচাই—
কে ? কে ? কে ছুটে পালায় ?
ফের ভালো ক'রে পড়ি লেখা আছে এগারো শো সন
১৩৫৭ বুঝি ব্যঙ্গ ক'রে যায় !

শুখ্‌নি নদীর এই রক্ত-চোষা বাঁক
সারাদিন কী যে ছাখে আঁধি ঝড়ে বালির মুকুরে,
দুপুরে পথিক পেলে রক্ত চুষে খায়—
কোথায় উদ্যানবাটী, কোথা রাজা দাশরথি রায়
শেষ ফোঁটা সবুজের ভস্মশেষ নিয়ে
দলে দলে পিপাসার্ত অণু উড়ে যায়—
জটিল জটলা ফেঁদে বুঁদ হ'য়ে দুপুরের রোদে
কী ভেবে যে ভগ্নজানু থামেরা দাঁড়ায় ?
অবিশ্রান্ত ধূলিমুঠি কেনই বা দুপুর ওড়ায় ?

কলকাতায় প্রেম

রাজলক্ষ্মী দেবী

এই মহানগরীর প্রেম
এই মহানগরীর মতো
জটিল, উদ্বিগ্ন, অন্তহীন।
নিঃশেষ হ'লেও তবু নিশ্চিহ্ন হয় না
এই মহানগরীর প্রাণ,
এই মহানগরীর প্রেম।

কলকাতা, আমি তোমায় ভালোবাসি,
তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

একদা মিলনে ছিলো সহজ সুযোগ।
ছিলো মহানগরীর বিপুল বিস্তৃতি,
যানবাহনের অভ্যর্থনা।
ছিলো লেক—তীর্থের মহিমা নিয়ে।
বটানিক্স—চৈত্রের চিড়িয়াখানায়
নির্জন দুপুর।
সুখসুবিধার লোকলোচনের করে না পরোয়া
মহানগরীর মন, এই
মহানগরীর প্রেম।

কলকাতা, আমি তোমায় ভালোবাসি
তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

এই মহানগরীর প্রেম
এই মহানগরীর মতো
অধীর উত্তেজনার বুদ্বুদ।

নেই তার রাখালী প্রেমের অবিচ্ছেদ পরমায়ু।
তা নিয়ে চলবে না অভিযোগ।
এ গঙ্গায় চলবে না হায় বাঁশি ভেঙে ভাসিয়ে দেওয়া।
কবিতা তোমার প্রেম ছাড়িয়ে বাঁচবে,
প্রেম হারিয়ে বাঁচাবে।

আহা, ক্ষয় হয়ে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।
মহানগরীর শতচঞ্চল স্নায়ুর কাঁপন সাহসী ভয়ে
নতুন কিছুর অপরিচয়ে।
হাজরার মোড়ে কতো যে কেঁপেছে চোখের ইচ্ছা—এবং শঙ্কা
ট্রামবাসভিড় ট্রাফিকনিয়মে,
চপল ভ্রমর ব্যর্থ হ'য়েই ঘুরে-ঘুরে ওড়ে,
এলো না আমার সময় এলো না।
হায়রে হাজার মুখের মধ্যে সেই চেনামুখ
কোথায় কোথায়—
হায় ভীরু প্রেম হায় রে!

দেখাশোনার দরজা বন্ধ,
অতএব খিড়কির আশ্বাস, কবিতা।
মনে-মনে ভাবা, মস্ত, জটিল, না-লেখা কবিতার মতো
এখনো স্পন্দিত হয়
এই মহানগরীর দিন
মহানগরীর প্রেম।

কলকাতা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

দুরন্ত দুপুর

নরেশ গুহ

এই দুষ্টু হাওয়া নিয়ে কত আর পারি ?
সামান্য গল্পের বই, সেও যেন রহস্যের শাড়ি,
পিঠ ঢাকা এলো চুল, ভয় ঢাকা কার বুক ঘিরে
শান্ত হয়ে শুয়ে আছে! কপট ছলনা নিয়ে ফিরে
তাই তার বার-বার আসা চাই : থেকে তাকে-তাকে
পাতা এলোমেলো ক'রে কখন পালাবে এক ফাঁকে।
কিছুই হয়নি যেন ! তার যেন মন প'ড়ে আছে
সাত-বাসি খবরের কাগজের নর্তকীর নাচে
মলিন গলির রোদে। ঘুরে-ঘুরে পাড়ায়-পাড়ায়
হঠাৎ কখন এসে কপাটের আড়ালে দাঁড়ায়,
নরম আঙুলে নাড়ে ঘামেভেজা কপালের চুল।
অবুঝ মনকে বলি : এখনো বোঝোনি তুমি ভুল ?
সিঁড়িতে নরম চটি, বারান্দায় কার ঠাণ্ডা স্বর
কেন মিথ্যে শোনো তুমি ?

তবু ঘুরি এ-ঘর ও-ঘর ;
ছাদের সিঁড়িতে থামি, নেমে এসে ঢকঢক খাই
কোণের কুঁজোর জল। অসতর্ক অভ্যাসে দাঁড়াই
বিবর্ণ আয়নার পাশে।—কী তন্ময় স্নিগ্ধ চোখে চায়
শূন্য ঘরে শঙ্খশাদা এ-কঠিন দেয়ালের গায়ে
যামিনী রায়ের ছবি : এ-জীবনে যা আছে জানার,
যত শোক যত সুখ, কান্নার করাতে যত ধার ;
যে-যে ঘাসে যে-যে রং, হৃদয়ের যতটা উষ্ণতা
জানা চাই সব জেনে, পরম নির্বাক শেষ কথা
উচ্চারণ করে তার তৃপ্ত চোখ—'শান্ত হও মন।'

—আমি ভাবি জীবনের এ-ইস্কুলে বাজাবে কখন
শেষ ঘণ্টা ? কবে আমি শেষ লেখা লিখে দিয়ে শ্লেটে
সন্ধ্যাতারা গুনে-গুনে নদীর পাড়ির পথ হেঁটে
বাড়ি যাবো ? ব'সে-ব'সে হাই ওঠে, ঘুমে চোখ ভরে।

দুপুরে দুরন্ত হাওয়া : মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে ?

হাওয়ার হাঁস

নরেশ গুহ

তোমাকে আমি কী ননী দেব, কী সর ?
দীঘির ধারে বনের আড়ে
শ্যামল শিশু যে-গাছ বাড়ে
তোমায় দেব তার উন্মত্ত
লাল পলাশের কেশর।

যে-হাওয়া নাড়ে পাতারে তার
ঢেউয়েরে করে সাপের সাঁতার
শিশির কাড়ে যে-হাওয়া তার ফুলে,
উড়াল পাখির ঝাঁকে মিশে
বিদেশ বেড়ায়, গমের শীষে
শীত ঝরায় মেঘের চাঁদর খুলে :
পুব পাহাড়ে কাঠের ঘরে
সরাল হাঁসের বালির চরে
হাওয়ার সে-চর পাঠাবো শত শত,
আকাশতলে যা-কিছু ধরে
ঘাসের ঘরে তারার ঘরে

আনবে খুঁজে তোমার মনোমতো।
দিন জুড়াবে ঝিঁঝিঁর গানে
হাওয়ার হাঁস ঘরের টানে
খবর ঠোঁটে ফিরবে ঝাঁকে-ঝাঁকে,
তখন মায়ের কোলে ঘুমোয়
ক্ষান্ত শিশু শান্ত চুমোয় :
নীল কুয়াশা বেড়ায় গাছের ফাঁকে।

বসন্তের শেষ

মৃণালকান্তি

১

পিঙ্গল ধূসর আলো দীর্ঘশ্বাস-কণ্টকিত দিন।
একে-একে ঝ'রে গেছে বসন্তের পালক রঙিন।
পিপাসিত পুষ্পবীথি, তাম্রবর্ণ বৈশাখের বন।
উড়ে যায় অবিশ্রান্ত সময়ের পাখি উদাসীন!
অলক্ষিতে স্বপ্নের প্রহর শেষ সহসা কখন ;
জীবন রয়েছে শুধু, ভ্রষ্টলগ্ন জীবনের বেলা!
ধূ-ধূ শূন্য সময়ের মরুভূমি, স্তব্ধ ব'সে আছি—
বিষণ্ণ মনের রৌদ্রে ঘোরে ম্লান স্মৃতির মৌমাছি।

২

এইখানে কী গভীর স্তব্ধ কালো রাত,
দিগন্তবিলীন ধূ-ধূ বিস্মৃতি অপার।
মেঘের ঘুমন্ত দেশে তুমি যেন চাঁদ,
তোমার হৃদয়ে নীল আকাশ-বিহার।

বেঁধেছ অনেক দূর স্বপ্নলোকে বাসা,
নির্জন বাতাসে কাঁদে আমার পিপাসা।
হৃদয়শাখায় ঝরে শীতের প্রহার,
এই ছায়া পাতা ফুল পথের ধূলার!

কতোকাল

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

কতোকাল হ'লো, এখানে তো তুমি আসো না ;
এলোমেলো ঘরে ছড়ানো মনের অগোছালো আশা-বাসনা!
তুমি বলেছিলে শেষে সব স'য়ে যাবে
তোমার দুঃখ বুকে তুলে নিতে দু'হাত বাড়াবে কাল,
হাসবে সকাল শিশুর মতন তোমার জানালা ধ'রে
সব ক্ষতি মুছে সোনারোদ দেবে
তোমার উঠোন ভ'রে।

খেয়া পার হবে দুঃখ আমার
শীতের শিশির বিঁধবে বুকের হাড়ে
আকাশ চাবে না নীলচোখে
কোন বজ্র হানবে দৈব,
বুকে হাত চেপে সইবো সে, ভালোবাসা!

এই ছড়া বেঁধে বোঝাতে চেয়েছি মন সে-তো নয় ফেলনা,
হাট ঘুরে তোরে এনে তো দিয়েছি আধ্যাত্মিক খেলনা ;
যতদূরে থাক মনে-মনে সে-তো
মনেরি মতন রইবে,

মাটির দেয়ালে হানা দেয় আজ
তবু কোন দুর্দৈব !

উত্তর হ'তে হাওয়া দেয় আর দক্ষিণ তোলে খিল,
আনীল আকাশে ছলছল করে মৃগনয়নের ছলনা—
কে তারে বাঁধলো বলো !
প্রহর এখানে ধূসর, কেবল সবুজ মাঠের ছায়া
এখানে ছড়ায় গৃহস্থালির মায়া ;

ধুলো ঝেড়ে মুছে পাতো সংসার, কেউ করো ঘরকন্না।
হায় রে অবুঝ কন্যা,
কতো কাল হ'লো, এখানে তো তুমি আসো না
নির্জন ঘরে ছড়ায় মনের
অগোছালো আশা-বাসনা।

অব্যক্ত

প্রবোধচন্দ্র পাল

তোমারে পেয়েছি আমি।
এই আবির্ভাবে
আমারে বিহ্বল করে বাণীর অভাব।
পারি না, পারি না
তোমারে জানাতে অভ্যর্থনা
পরিস্ফুট ব্যঞ্জনায়।
রুদ্ধ স্বর,
অভিভূত আমার আকুতি।

এই ত্রুটি
যদি পারো, প্রিয়তমা,
ক্ষমা কোরো।
শুধু ক্ষমা ?
আরো। হানো তুমি, এই অন্তরাল
তুমিই ঘুচিয়ে দিয়ে দূর করো জড়তার কঠিন জঞ্জাল।

আশঙ্কায় দোলে মন, তবু আশা আছে।
প্রিয়, এই অন্ধকারে দৃষ্টির দুয়ারে
তোমার নিঃশব্দ পদপাত
উন্মুক্ত স্বর্গের প্রান্তে বার-বার ডাক দিয়ে যায়।
সে-স্বর্গ ক্ষণিক। যে-আঘাত
ব্যক্তির সীমানা ভেঙে সুখদুঃখ অতিক্রম ক'রে
আশ্চর্য নূতন বাঁকে জীবনেরে দেয় সার্থকতা,
কবিতায় দীপ্ত হয় দৈনিক তুচ্ছতা
সে-আঘাত হানো।
এই নীরবতা
অসহ্য আমার। কথা বলো,
তুমি কথা বলো—আমারে বলাও।
তোমারে এখনো
পেয়েও পাইনি, এই বঞ্চনার পুঞ্জিত মূঢ়তা
দূর হ'য়ে দেখা দিক বাণীর পূর্ণতা।

পাথেয়

শঙ্খ ঘোষ

এমনো যে দিন ছিলো না তা নয়
যখন তোমার চলনে
কতই ঝরেছে ঐতিহাসিক ছলনা।
এমনো সময় ছিলো না তা নয়
যখন তোমার গর্ব
ভেবেই পাইনি কয়টা বিশ্বে ধরবে।
জানি না এখনো সেই সব খেলা
তেমনি করো কি করো না,
যত ব'সে ভাবি, শুধু মনে পড়ে
তোমার চোখের করুণা।

'কবিতা'র জন্য

মণীন্দ্র রায়

বুদ্ধদেববাবু ছিলেন কলেজ-দিনে শিক্ষক
বারো বছর আগে ; কাব্য লিখছি সেই ইস্তক।
বুড়ো নই যে স্মৃতিকথায় টানব মিষ্টি আমেজ ;
বড় কবি নই, লেখনে আনব চারিত্র্য-তেজ !
তবু যখন জানিয়ে দিল সম্পাদকের টীকা
এই বছরেই উঠে যাবে 'কবিতা' পত্রিকা,—
কী খারাপ যে লাগল, আহা, এ প্রিয়-বিচ্ছেদ,
চাপতে গিয়েও বেরিয়ে এল পুঞ্জীভূত খেদ !

জানি বটে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চদশীর নামে
গান লিখেছেন, ('কবিতা' তাই ঐ অঙ্কেই থামে ?)
ও-সংখ্যাটা চাঁদের পক্ষে ষোলো কলার সাক্ষী,
প্রতিষ্ঠানের বেলায় সেটা অলক্ষুনে বাক্যি !

ইতিহাসকে চিনি এবং কালের নিয়ম জানি ;
প্রয়োজনের শেষমোড়ে তার থাকবেই হাতছানি।
সাহিত্যেরও দায়িত্বে যে স্থায়িত্ব নেই, সত্য—
যদি না তার কালের সঙ্গে ঘটে ঐকমত্য।

'কবিতা'র কি এল সে-খন বনবাসে যাবার,
বাংলাদেশে এ-আন্দোলন দিন করেছে কাবার ?
স্বকালচেতন নয় কি-না সে জানি অন্য তর্ক,
মানব না কো নেই 'কবিতা'র ইতিহে সম্পর্ক।
আজও দেখি অনেক লেখক মক্স করে কাব্য
'কবিতা'তেই, বহুর মাঝে রয়েছে সম্ভাব্য
নতুন কবি, (প্রতিভার তো আকাল ! লেখে ক-জন ?
এ-গোষ্ঠী যা লেখেন, ও-দল করেন সবই বর্জন !)
মতামতের দলাদলি, কানাগলির চক্রে
সানন্দে ডাক দিই 'কবিতা'র নতুন লেখকবর্গে।
সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সার্থক কি বৃথা,
বাংলাদেশে বেঁচে থাকুক কাব্য আর 'কবিতা' !

নিজের অতীত দিনের স্মৃতি—সেই 'কবিতাভবন',
আজকে যাঁরা মহৎ, তাঁদের আলাপী গুঞ্জন,
কত কবির লেখায়-লেখায় সুস্থ প্রতিযোগিতা—
মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় পুরোনো সেই 'কবিতা' !

বুদ্ধদেববাবু, আপনি পঞ্চদশের শেষে
নিজের হাতের সৃষ্টি কি আজ দেবেন নিরুদ্দেশে ?
'প্রাপ্তে তু ষোড়শে' পুত্র জানেন তো হয় মিত্র !
চোখের সামনে রাখুন এঁকে সেই আগামীর চিত্র ॥

AN INDIAN DAY

Noel Scott

I watched a bullock sway
Away from the sun-stained day
Towards the night,
And saw the tight, the bright
Quivering dry size of its thighs
Fade in the dust of a road in India.

I watched a leper squat,
Rot by the very spot
Where the beast
Had laid like a priest its feast
Before the adoring eyes of the flies
Riding the dust of a road in India.

I watched a woman cry,
Lie in the gutter and die,
Her moans,
Thin like the stones of her bones,
Drift to the rusted rise of the skies
High above the dust of a road in India.

Such was the common day.
Say it is far away—
Yes;
But not the less confess
That hot in the dust of a road in India
A terrible prize, a destiny, lies.

সমালোচনা

বন্দে মাতরম, নিশিকান্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ৩৲

নাম শুনে যা মনে হয় তা নয়; ভারতমুক্তির উপলক্ষ্যে দেশমাতৃকার বন্দনা নয়। পাতা উল্টিয়ে যা মনে হয় তাও নয়, দুর্গা, কালী কিংবা অন্য কোনো কাল্পনিক দেবীর স্তবগান নয়। পণ্ডিচেরির আশ্রমবাসী এবং ভক্তমণ্ডলী যাঁকে 'শ্রীমা' ব'লে থাকেন, বইটি একান্তরূপে তাঁরই বন্দনা। এ-তথ্য বাইরে থেকে জানতে হয় না, কবিতাতেই তা বলা আছে।

মূর্তিয়া জীবনে তব যেথা তুমি জগতের যোগীন্দ্রসঙ্গিনী।
জগন্মাতা শিব-সীমন্তিনী!
তব অভ্যুদয়-দেশে কে তোমারে বলে বিদেশিনী? (পৃঃ ৩)

'বিদেশিনী' শুনে অজ্ঞ পাঠকের হয়তো ধাঁধাঁ লাগবে, কিন্তু তিনি যদি ধৈর্য ধ'রে প'ড়ে যেতে পারেন তাহ'লেই পরিষ্কার সব বুঝবেন।

এবার পূজায় দ্বিভুজার রূপে ভবানী দশভুজারে
দেখি দক্ষিণ-ভারত-সিন্ধুপারে:
দেবী ভগবতী মানবীতনুর রথে
বহে যোগ-বলে পার্থিবতার পথে
মর-দুর্গতি-বিনাশের অভিযান,
যোগেশ্বরীর অবিচল সাথী অবতার-ভগবান
যোগীন্দ্র-অরবিন্দে মূর্তিমান! (১৯ পৃঃ)

এর পর আর কোনো সংশয় থাকে না।

এ ক্ষেত্রে শুধু ভক্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য বেরোলেই এই গ্রন্থপ্রকাশ সার্থক হ'তো। কিন্তু না, বইটির লক্ষ্য পাঠকসাধারণ, তিন টাকা মূল্যও ধার্য করা আছে। তাহ'লে মনে করা যেতে পারে যে গোষ্ঠীগত বক্তব্য বাদ দিয়ে রচনারই কিছু মূল্য আছে—বিশেষত কবি যখন নিশিকান্তর মতো একদা-শিল্পনিপুণ? 'দিগন্তরেখা দ্বিখণ্ড করি' দাঁড়ায়েছে তালতরু'-র মতো কোনো ছবি, বিড়ালের চোখে 'তিমিরদীর্ণ সূর্যহীরকে'র মতো কোনো দ্যুতির বিস্ময়—অন্তত কোনো পংক্তিপ্রসাধনের নৈপুণ্য? একেবারে কিছুই পাবো না তা কি হ'তে পারে?

কিন্তু কিছুই পেলাম না। অনেক-পাতা-জোড়া লম্বা কবিতা, তার কোনো-কোনোটি সংস্কৃত ছন্দে গুরুগম্ভীর, মোটা-মোটা কথায় আর প্রকট অনুপ্রাসে সযত্নবিন্যস্ত সেই সঙ্গে গানের আকারে ছোটো কিছু রচনা, কিন্তু সমস্তটাই বাগাড়ম্বর, শুধু উচ্ছ্বাস, বস্তু কিছু নেই।

এস মা দুর্গা এস দুর্গত জগতের গতি নাশিনী,
এস অখিলের তমোগহ্বরশর্বরী-উদ্ভাসিনী,
এস সুবর্ণা
দেবী অপর্ণা,
স্বর্ণ-তপন-হাসিনী! (১৬ পৃঃ)

মম মলিনমানসলীন মৃন্ময়তা মাঝে
সুদূর-তারা-পারাবারের যুগল-মণি রাজে,
কত কালের সুপ্তি টুটি' চেতন ওঠে জাগি'
দীপ্ত পরশনে। (৩৪ পৃঃ)

বেছে-বেছে অপেক্ষাকৃত সহনীয় দুটি অংশ উদ্ধার করলাম। প্রথমটির বিষয়ে কিছু না-বলাই ভালো, দ্বিতীয়টির শেষ দু-লাইন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবহ ব'লেই সুখকর।

ওরে আয়রে, তোরা আয়,
তোরা আয় আয় আয়,
মায়ের সোনার ফসল ফলার বেলা যায় যে বয়ে যায়। (২০ পৃঃ)

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'র পর এও লেখার প্রয়োজন ছিলো না।

ভূমিকায় প্রকাশক জানিয়েছেন যে 'শ্রীঅরবিন্দর দিব্য স্পর্শে' নিশিকান্তর কাব্য বর্তমানে 'অপরূপ রূপ' নিয়েছে। 'অপরূপ' কথাটা হয়তো ভেবে-চিন্তেই বসানো হয়েছে, হয়তো তার অর্থ এই যে এই কাব্যের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক মর্মে পৌঁছতে না-পারলে পাঠক যেন নিজের অক্ষমতাকেই সে-জন্য দায়ী করেন। আধ্যাত্মিকতায় কারো মনোপোলি আছে কিনা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে কাব্যের আবেদন তার নিজস্ব, যার ফলে নাস্তিকও 'গীতাঞ্জলি' প'ড়ে অভিভূত হয়েছেন, এবং ইএটস-এর উত্তর-কবিতা ভালোবাসতে হ'লে সেই সঙ্গে অলৌকিক তত্ত্বেও বিশ্বাসী হ'তে হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে নিশিকান্তর কবিকণ্ঠ যদি কোথাও শুনতে পেতাম, তাহ'লে এ-ক্ষেত্রেও তা-ই

হ'তো; যারা শ্রীঅরবিন্দকে অবতার ব'লে মানে না, কিংবা অবতারবাদই মানে না, কাব্যের কারণেই একে তারা মূল্য দিতেন। কবিত্বের এই মোহিনী শক্তি নিশিকান্ত 'অলকানন্দা' পর্যন্ত কোনোরকমে জীইয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু—গভীর দুঃখ নিয়েই বলছি—এখানে তা একেবারে অনুপস্থিত। হয়তো কোনো-এক স্বচ্ছ মুহূর্তে নিজেই তা বুঝতে পেরে তিনি একটি 'পরিচয়'-পত্র লিখেছেন:

আমারে করিয়ো ক্ষমা, হে পাঠক, হে সমালোচক!
তোমাদের তরে আমি আনি নাই শ্রবণ-রোচক
সুরের ঝংকারধারা, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর
অক্ষরবৃত্তের ছন্দে গ্রন্থিবাঁধা শৃঙ্খলালংকার।

এই স্তবকটিই একটু বদলে লিখলে গ্রন্থের পরিচয় ঠিক যথার্থ হ'তে পারে:

আমারে করিয়ো ক্ষমা, হে পাঠক, হে সমালোচক!
তোমাদের তরে শুধু আনিয়াছি শ্রবণ-রোচক
ছন্দের ঝংকারধারা, হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরমালা, আর
অসংবৃত অনুপ্রাসে গ্রন্থিবাঁধা শৃঙ্খলালংকার।

কোনো মতবাদের পৈতে নিলে শক্তিশালী কবিরও অধঃপতন ঘ'টে থাকে এ-কথা যাঁরা প্রমাণ করতে চান, তাঁদের পক্ষে 'বন্দে মাতরম' পরম উপযোগী উদাহরণ। তবে হয়তো অন্য অনেকের মতো নিশিকান্তর পতন এমনিও হ'তো, স্বভাবতই পুঁজি ফুরোতো, কিন্তু 'দিব্য স্পর্শে'র প্রভাবে উল্টোটাই তো উচিত ছিলো?

রবীন্দ্র-সংগীত: শান্তিদেব ঘোষ। ৪৲
স্বরবিতান: ৬, ৭, ৮, ৯। প্রত্যেকটি ২৷৷০
নৃত্য: প্রতিমা দেবী। ৩৲
} বিশ্বভারতী

সাময়িক পত্রাদিতে বিচ্ছিন্ন আলোচনা ১৯৪১-এর পর থেকে অনেক হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে গ্রন্থ এখনো 'রবীন্দ্র-সংগীত' একমাত্র। সাত বছর আগে প্রথম বেরিয়েছিলো, নতুন সংস্করণে গ্রন্থের পরিধি আরো ব্যাপক, আকার প্রায় দ্বিগুণ। লেখক শুধু গানের আলোচনাতেই ক্ষান্ত হননি, নৃত্য এবং নাটকের বিষয়েও বলেছেন, তার উপর তাঁর স্মৃতিকথার পুঁজিও বড়ো কম না—এই সব বহুবিধ কারণেই এ-বই মূল্যবান। পরিশেষে নির্দেশিকা বা ইনডেক্স দেখতে পেয়ে সুখী হলাম; ও-বস্তুটির অভাবে বাংলা বইয়ের যথাযথ ব্যবহারে প্রায়ই বিঘ্ন ঘ'টে থাকে।

'স্বরবিতানে'র খণ্ড ক-টিতে 'বসন্ত', 'ফাল্গুনী', 'প্রায়শ্চিত্ত', এই তিনটি নাটকের সমগ্র স্বরলিপি প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হ'লো, ১৩২৯-এ নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ-করা 'বসন্তে'র পুরো পুঁথিটাই ছাপানো আছে। অষ্টম খণ্ডের উপাদান তিরিশটি ব্রহ্মসংগীত—রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতম রচনা। 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে/শোনো শোনো পিতা/কহো কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে/মঙ্গল-বারতা' কিংবা 'সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,/নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই' রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে যে-কোনো বয়সে লিখতে পেরেছিলেন আমরা তা ভেবে পাই না। ব্রহ্ম-সংগীতের শ্রেষ্ঠাংশ বোধহয় চারের খণ্ডেই গৃহীত হ'য়ে গেছে, অবশ্য 'আঁধার রজনী পোহালো' এ-খণ্ডেরই অন্তর্গত। স্বরলিপি করেছেন নানা সময়ে নানা জন; 'বসন্ত' পুরোটা দিনেন্দ্রনাথের, আটের খণ্ড ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর, অন্যান্যদের মধ্যে শৈলজারঞ্জন, অনাদিকুমার আছেন। স্টার থিয়েটারে একদা-দেশ-ভাসানো 'তোমায় নতুন ক'রে পাবো ব'লেই হারাই ক্ষণে ক্ষণ'-এর স্বরলিপি শ্রীমতী সাহানা দেবীর রেকর্ড অবলম্বনে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের বিস্ময়লোকে এখনো খুব আনাগোনা শুরু হয়নি। 'নৃত্য' এ-বিষয়ে প্রথম বই। বিস্তারিত আলোচনা নয়, কঠোরভাবে টেকনিক্যালও বলা যায় না, স্মৃতিকথাও অনিবার্যতই এসেছে। বইটি তাই সহজেই উপভোগ্য। কিন্তু 'শ্যামা'র কোনো উল্লেখ নেই ব'লে অসম্পূর্ণ লাগলো। ত্রয়ী নৃত্যনাট্যের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ বিচারে কেউ কারো কাছে হারে না, কিন্তু কোনো-কোনো দিক থেকে 'শ্যামা'র অনন্যতা সুস্পষ্ট। 'শ্যামা'য় বিষয়ের পার্থিবতা পরম, তাই তো নায়িকার ঐ নাম। ভারতীয় ঐতিহ্যে ট্র্যাজেডি নেই, রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবেও তা ছিলো না, ট্র্যাজিক উপপ্লব এবং চিত্তশুদ্ধির আস্বাদ যদি তিনি কোথাও দিয়ে থাকেন, সম্ভবত —'মালিনী' বাদ দিয়ে—তা শুধু এখানেই। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো সুযোগে প্রতিমা দেবী 'শ্যামা' নিয়েও আলোচনা করবেন।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা নাচের ভঙ্গির কয়েকটি ছবি 'নৃত্যে'র অন্যতর আকর্ষণ। মনোরম বহিরবয়ব, উপহারের উপযোগী।

বু. ব.

—

দিগন্ত, শ্রীমৃণালকান্তি। ২য় সং, কবিতাভবন। ১৷৷০

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশের এই কাব্যগ্রন্থটি ১৩৫১ সালে প্রথম যখন বেরোয়, তখন 'কবিতা'য় এর সমালোচনা হয়েছিলো। নতুন সংস্করণ পরিবর্ধিত, সুদৃশ্য, এখনকার অঙ্কে দামেও শস্তা। কবিতাগুলি মধুর বিষণ্ণ

সুরে একতারার বাজনার মতো, এই রুক্ষতার যুগে বিশেষভাবে তৃপ্তিকর। কিন্তু কবি হঠাৎ পদবীবর্জন করলেন?

পত্র

'VERNACULAR'

'কবিতা' সম্পাদক সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

যখন দেখি মাতৃভাষা নিয়ে হৈ-চৈয়ের অন্ত নেই, অথচ তার নামকরণে পুরোনো আমলের অপমান থেকেই গেলো, তখন 'কবিতা'র দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় এখনো মাতৃভাষার নাম Vernacular। এই ইংরেজি কথাটার গ্লানিকর ভারতীয় ইতিহাস সকলেই জানেন, তার উৎপত্তির কলঙ্ককথাও সকলেই জানেন। সংস্কৃত 'বর্ষ' শব্দের আত্মীয় ল্যাটিন verna থেকে এর উদ্ভব। Verna=দাস (home-born slave), vernacular =দাসভাষা, বিজিত জাতির ভাষার অর্থে রোমকসমাজে ওর ব্যবহার হ'তো।

আজকাল সকলেই দেখছি বাংলা ভাষার ভালোবাসায় উচ্ছল। আমাদের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, নেতারা—সকলেরই শিরঃপীড়া তাকে নিয়ে। পরিভাষা উদ্ভাবন, বানান বর্ণমালার সংস্কার, মুদ্রণ আর টাইপরাইটারের উন্নতি—সবই নাকি জরুরি দরকার। পরীক্ষার খাতাতেও পাংক্তেয় হ'লো, এদিকে রেডিওতে ঘন-ঘন 'আ মরি বাংলা ভাষা'র উচ্ছ্বাস। তবে কি সত্যি আমাদের কপাল ফিরলো এতদিনে?

না! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে বাংলা ব'লে কোনো ভাষাই তো নেই, ওটা একটা vernacular, বর্বরের বোল। তুচ্ছ একটা দাসভাষা নিয়ে এত কিসের মাথাব্যথা। আরো আশ্চর্য এই যে কথাটার ব্যবহার সারা দেশে এখন আর-কোথাও নেই, গবর্মেণ্টে না, কোনো প্রতিষ্ঠানে না, কোনো সংবাদপত্রে না, আছে শুধু কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন পাটনায় বা যুক্তপ্রদেশে, তাঁরাও 'হিন্দী' বা 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা' ব্যবহার করছেন। শুধু এই নিকষকুলীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালেই Vernacular-এর পঙ্কতিলক আজও বিরাজমান।

পণ্ডিত নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে এ-বিষয়ে বেশ কড়া ক'রেই বলেছিলেন (P. 452, Ed. 1937); সম্প্রতি—হয়তো তাঁরই প্রভাবে—কত কটুগন্ধ কথার উচ্ছেদ হ'লো, Asiatic-এর বদলে Asian পেলাম, কুলির বদলে মজদুর। শুধু কি কলেজ স্কোয়ারই কালো হ'য়ে থাকবে? অন্তত ছাত্রছাত্রীদের তো আত্মসম্মান আছে! ইতি

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

THE WISDOM OF AN ANCIENT SAGE
RENDERED BY A MODERN MASTER

CONFUCIUS

The Unwobbling Pivot & The Great Digest translated with notes & commentary by

EZRA POUND

Handsome Indian Edition : Rs. 9/8/-

Published for
KAVITABHAVAN
by
ORIENT LONGMANS LTD.

17, Chittaranjan Avenue Calcutta 13
Nicol Road, Ballard Estate, Bombay
36A, Mount Road, Madras.
Also available at Kavitabhavan.

QUARTERLY **NINE** TWO SHILLINGS

The Spring number is devoted to

CONTEMPORARY VERSE

Contributors include *Ezra Pound, H. D., Marianne Moore, Richard Eberhart, Kathleen Raine, Charles Madge, Ronald Bottrall, Basil Bunting, H. G. Porteus, David Gascoyne, Kathleen Nott, Bro. George Every, S.S.M., C. H. Sisson, Ronald Duncan, G. S. Fraser, John Heath-Stubbs, Sidney Goodsir Smith, Kenneth Gee, Howard Griffin, Michael Hamburger, Maurice Carpenter* and others. Also articles on the poetry of *Roy Cambell & Stephen Spender.*

Edited and published by
PETER RUSSELL, 114 Queens Gate, London, S.W. 7
Annual Subscription : U.K. 8/8 (post free) : U.S. $2 (post free)

ছোটোগল্প

গ্রন্থমালা

পৌষ ১৩৫০-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম তেরোটি সংখ্যা নিঃশেষিত।

১৪.	অভাগীর স্বর্গ দেশ-মুক্তি	পূর্ণশশী দেবী
১৫.	রেল-লাইন	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১৬.	যশোমতী মর্মর	অনসূয়া দেবী দেবীপদ ভট্টাচার্য
১৭-১৮.	একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা	বুদ্ধদেব বসু
১৯.	সাবিত্রী নতুন লেখক	পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী
২০.	হাসন সখী	অন্নদাশঙ্কর রায়
২১.	মহাপ্রাণ	কমলাকান্ত
২২.	মুমূর্ষা	বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩.	মুক্তি	কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
২৪.	উর্মিলা	পুষ্প বসু
২৫.	গামানুষ জাতির কথা	রাজশেখর বসু
২৬.	পুনরুত্থান	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২৭.	অপরূপা	প্রতিভা বসু
২৮.	আলো, আরো আলো	মসতি বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার
২৯.	একটি কি দুটি পাখি	বুদ্ধদেব বসু
৩০.	ভগভারণবাবু মেয়েরা	পরিমল রায়
৩১-৩২.	পাটির পরে	ক্যাথারিন ম্যান্সফীল্ড
৩৩.	বেনামী বন্দর	বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪-৩৫.	ভগতীর মন	নরেশ গুহ

'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা', 'পাটির পরে'
'ভগতীর মন' প্রত্যেকটি আট আনা।
অন্যান্য সংখ্যা পাঁচ আনা ক'রে। সবগুলি সংখ্যা একসঙ্গে **পাঁচ টাকা।**
এই গ্রন্থমালা সম্পাদনা করেছেন প্রতিভা বসু।

কবিতাভবন। ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

KAVITA

(Poetry)

CALCUTTA

Vol. 15, No. 2, Serial No. 64

MARCH, 1950

Editor : Buddhadeva Bose. Published quarterly by Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India. Subscription : 6s. 6d. or S I. 50 a year, post free.